The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

ফারসি কাব্যশৈলীর ধ্রুপদি ধারা: ঐতিহ্য ও প্রভাব

[The Classical Tradition of Persian Poetic Style: Heritage and Influence]

Dr. Syaid Abu Abdullah
Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh
Dr. Rizwana Islam Shammi
Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:
Received : 26 May 2025
Received in revised: 01 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Classical Persian Poetic Tradition, Hafez, Saadi, Attar, Rumi, Sabke Khorasani, Sabke Iraqi

ABSTRACT

This paper explores the classical tradition of Persian poetic style, tracing its evolution from early court poetry to the refined aesthetics of poets like Hafez, Saadi, and Rumi. It examines the structural features—such as meter, rhyme, and metaphor—as well as the philosophical and mystical dimensions rooted in Persian culture. The study highlights how this poetic heritage influenced neighbouring literary traditions across the Islamic world and beyond. By analysing key texts and stylistic patterns, the paper demonstrates how classical Persian poetry shaped a unique literary identity that continues to inspire and resonate in contemporary thought.

ভূমিকা

ফারসি কবিতা বিশ্বের অন্যতম সূক্ষ্ম ও প্রভাবশালী সাহিত্যিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত। হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে বিকশিত এ কাব্যধারা শুধু ইরানের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিচিতিকে নয়; বরং সমগ্র ইসলামি বিশ্ব, মধ্য এশিয়া এবং উপমহাদেশের সাহিত্যকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। মধ্যযুগে পরিপক্ব হয়ে ওঠা ধ্রুপদি ফারসি কাব্যশৈলী কল্পনা, ছন্দ ও প্রতীকের পরিমার্জিত ব্যবহারে বিশেষভাবে চিহ্নিত। এতে গযল, মসনভি, কাসিদা ও রুবাইয়াত প্রভৃতি ছন্দবদ্ধ রূপ অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর প্রত্যেকটি নিজস্ব কাঠামো ও বিষয়বস্তুর ঐশ্বর্য ধারণ করে। এ কাব্যশৈলীর শেকড় প্রাক-ইসলামি মৌখিক ঐতিহ্যে এবং তা পরবর্তীকালে সুফিবাদ ও ইসলামি দর্শনে সমৃদ্ধ হয়েছে। ফারসি কবিগণ প্রেম, আধ্যাত্মিক আকুলতা, নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং দার্শনিক অনুধ্যানের ভাষ্য রচনায় ফারসি কবিতাকে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ফেরদৌসি, ওমর খৈয়াম, সা'দি, রুমি ও হাফিয প্রমুখ কবি ভাষার উচ্চতর সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যমে অনন্য কাব্যিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ প্রবন্ধে ধ্রুপদি ফারসি কাব্যশৈলীর ঐতিহ্য ও নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া এ কাব্যরীতির অন্তর্নিহিত কৌশল, প্রতীকী ব্যঞ্জনা এবং বহুল প্রভাবিত বৈশ্বিক উত্তরাধিকার অনুধাবন করাই মূল উদ্দেশ্য।

ফারসি ভাষার উৎপত্তি ও কবিতার ভূমিকা

ফারসি ভাষার উৎপত্তি প্রাচীন ইরানের ফারস অঞ্চলে, যার শেকড় গেঁথে আছে পুরাতন পারসিক (Old Persian) ও পাহলভি ভাষার ঐতিহ্যে। ইসলাম আগমনের পর ভাষাটি আরবি লিপিতে রূপান্তরিত হয় এবং নবজাগরণের পথে অগ্রসর হয়। নবম শতাব্দী থেকে ফারসি ভাষায় সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে কবিতা রচনার এক নতুন ধারা শুরু হয়, যার কেন্দ্র ছিল সামানীয় দরবার। ফারসি কবিতা খুব দ্রুত রাজসভা, সুফি খানকাহ, মাদ্রাসা ও সাধারণ মানুষের অন্তর্জগতে জায়গা করে নেয়। ফারসি কবিতায় শুধু সৌন্দর্যচর্চা নয়; বরং আত্মজিজ্ঞাসা, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক অনন্য মাধ্যম।[১] সুফি কবিগণ এ ভাষাকে ব্যবহার করেছেন আল্লাহ ও প্রেমের গভীর মর্ম উপলব্ধি করতে। এ বিষয়ে মাওলানা রুমি বলেন,

جسم خاك از عشق بر افلاك شد * كوه در رقص آمد و چالاك شد.[٢]

'ধুলোর দেহ ভালোবাসায় আকাশে উঠে গেল,
পর্বত নৃত্যে মেপে উঠলো এবং চঞ্চল হয়ে উঠলো।'

এ পঙক্তিতে রুমি বলছেন, প্রেমই সৃষ্টির ভিত্তি। আল্লাহর প্রেম মানুষকে সৃষ্টি করেছে এবং সে প্রেমেই মানুষ ডুবে থাকে।

মহিলা কবি জাহান মুলক খাতুন বলেন,

ای دوست به فریاد دل خستهٔ ما رس * بفرست نوایی من بی برگ و نوا را.[৩]

'হে প্রিয়তম, আমাদের ক্লান্ত হৃদয়ের আর্তিতে সাড়া দাও,
এ নিঃস্ব ও অসহায়কে একটুখানি অনুগ্রহ পাঠাও।'

এ কবিতায় তিনি গভীর আত্মিক ভালোবাসার অনুভব ব্যক্ত করছেন, যেখানে একমাত্র আল্লাহর উপরই তার নির্ভরতা।

কবি হাফিয শিরাযি বলেন,

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد * عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.[৪]

'আদি কালে, তোমার সৌন্দর্যের দীপ্তি ঝলসে উঠেছিল
সেই থেকে প্রেম জন্ম নিল এবং তা গোটা জগতে আগুন জ্বালিয়ে দিল।'

হাফিয এখানে আল্লাহর সৌন্দর্য এবং তার প্রেমিক শক্তির বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার কথা বলেছেন।

ফরিদ উদ্দিন আত্তার বলেন,

عشق آن شعله‌ست کز بهر خداست * گر نباشد، جمله عالم بی‌وفاست.[৫]

'প্রেম সেই শিখা, যা কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে
যদি এ প্রেম না থাকে, তবে সারা দুনিয়াই হয় বিশ্বাসঘাতক।'

আত্তার আল্লাহর প্রতি সৎ প্রেমকে ঈমান ও আস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করছেন।

বেদিল দেহলভি বলেন,

من و ذوق تماشای کسی کز تاب رخسارش * جگر بر تابه چسبد آفتاب عالم‌آرا را.[৬]

'আমি আর সে রূপদর্শনের আনন্দ– যার মুখের দীপ্তির তাপে,
বিশ্ব-শোভা সূর্যও যেন তাওয়ার উপর লেগে থাকা যকৃতের মতো দগ্ধ হয়ে যায়।'

বেদিল এখানে বলেছেন, আত্মিক চক্ষু খুলে গেছে কেবল আল্লাহর ইচ্ছায়। তার প্রেমে হৃদয় সাড়া দেয়।

কবি কাসেম আনোয়ার বলেন,

جز عشق خدا، هرچه دلت را برباید * گر نیر شمسست که در عین زوالست.[৭]

'আল্লাহর প্রেম ব্যতীত যা কিছু তোমার হৃদয় হরণ করে,
সে যদি সূর্যের দীপ্তিও হয়– তবুও তা অস্তমুখী, ক্ষয়শীল।'

কবি এখানে প্রেমকে আল্লাহর অস্তিত্বের সঙ্গে সমার্থক করে তুলেছেন, যে প্রেম সৃষ্টি ও অস্তিত্বের মূল। এ ধরনের কবিতা শুধু ভাষার শৈল্পিক উৎকর্ষই নয়; বরং মানুষের আধ্যাত্মিক জগতের বহিঃপ্রকাশও। ফারসি কবিতা তাই ইতিহাসের পরিক্রমায় একটি বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নেয়, যা শুধু ইরান নয়, গোটা ইসলামি বিশ্বকে প্রভাবিত করেছে। উপমহাদেশেও এর প্রভাব সুগভীর এবং এখনও তা সাহিত্যের নানান শাখায় প্রতিফলিত হয়।

ফারসি কাব্যের তাৎপর্য

ফারসি কাব্য হলো ফারসি ভাষায় রচিত সাহিত্যিক কাব্যের এক বিশিষ্ট ধারা, যা প্রাচীন থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি ভাষার কাব্য নয়; বরং একটি সাংস্কৃতিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। ফারসি কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য হলো তার ছন্দ, রূপক, অলংকার ও গভীর ভাববৈচিত্র্য; যা পাঠককে এক মনোমুগ্ধকর সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ফারসি কাব্যের শুরু প্রাচীন পারসীয় সভ্যতার সাথে যুক্ত, যা পরবর্তীতে ইসলামি যুগে সুফি দর্শন ও মুসলিম সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়। ফেরদৌসির *শাহনামা*, ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত, রুমি, সা'দি ও হাফিযের গযল এ সাহিত্যের চিরন্তন নিদর্শন। এ কবিতাগুলো শুধু কাব্যের শৈল্পিক দিক দিয়ে নয়; বরং দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকেও অসাধারণ গুরুত্ব বহন করে। ফারসি কাব্যের তাৎপর্য তার বহুমাত্রিকতায় নিহিত। এটি শুধুমাত্র সৌন্দর্যের বাহক নয়; বরং মানুষের জীবন, প্রেম, প্রকৃতি, আত্মা, আল্লাহ ও নৈতিকতা সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনার প্রকাশ। বিশেষ করে সুফি কবিতায় এ দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া স্পষ্ট দেখা যায়।[৮] রুমির বিখ্যাত একটি কবিতা হলো,

بشنو از نی چون حکایت می‌کند * از جدایی‌ها شکایت می‌کند. [৭]

‘এ বাঁশি শুনো কীভাবে কষ্টের সূর বর্ণনা করছে,
বিচ্ছেদের বেদনায় কী আর্তনাদ করছে।’

রুমির এ পঙক্তিতে মানব আত্মার বিচ্ছেদের যন্ত্রণার এক গভীর বর্ণনা পাওয়া যায়, যা ফারসি কবিতার আধ্যাত্মিক গভীরতার দৃষ্টান্ত।

ফারসি কাব্য শুধু ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি ভারত, তুর্কি এবং মধ্য এশিয়ার সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে মুঘল ও দিল্লি সালতানাতের সময় ফারসি ভাষা ছিল প্রশাসনিক ও সাহিত্যিক প্রধান ভাষা, যা ঐ অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। ফারসি কাব্যের আরেকটি তাৎপর্য হলো এর ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সূরেলা শব্দচয়ন, যা সহজাত সঙ্গীতাত্মক এবং মনোরম। এর ছন্দ ও অলংকার পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায় এবং ভাষার মাধ্যমে অনুভূতির সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটায়। ফারসি কাব্য এক সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যা কেবল সাহিত্য নয়; বরং দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতির অঙ্গনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এর মাধ্যমে আমরা মানব জীবনের গভীরতর দিকগুলো অনুধাবন করি এবং এক ধ্রুপদি সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার সম্মিলন দেখতে পাই। ফারসি কবিতার এ বিশাল ঐতিহ্য ও তাৎপর্য আজও আধুনিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা হিসেবে বিবেচিত হয়, যা বিশ্বসাহিত্যের অমর সম্পদে পরিণত হয়েছে।[১০]

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে কবিতা

কবিতা কোনো ভাষার শুধু শৈল্পিক প্রকাশ নয়; বরং তা এক জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও মানসিকতার এক অন্তর্গত ধারক ও বাহক। ভাষা যেমন একটি জাতির অস্তিত্বের প্রকাশ, তেমনি কবিতা সে ভাষার হৃদয়, যেখানে কল্পনা, অনুভূতি ও চিন্তার জটিল সমাহার ঘটে। বিশেষত ফারসি কবিতার ক্ষেত্রে এটি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, যেখানে প্রতিটি শ্লোক শুধু সৌন্দর্য নয়; বরং একটি জীবনদর্শনের চিত্রও তুলে ধরে। ফারসি সাহিত্যে কবিতা ছিল ইতিহাস, ধর্ম, নৈতিকতা, প্রেম ও আত্মানুসন্ধানের মূল বাহন।[১১] ফারসি কবিগণ তাদের সমাজ, রাজনীতি ও আধ্যাত্মিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন কবিতার মাধ্যমে। যেমন সা'দি তার *'গুলিস্তান'*-এ বর্ণনা করেন,

بنی آدم اعضای یک پیکرند * که در آفرینش ز یک گوهرند. [١٢]

‘সব মানুষ এক দেহের অঙ্গ,
যারা একই মূল থেকে সৃষ্ট।’

এ দু'টি পঙক্তি শুধু কাব্যিক সৌন্দর্যের নয়; বরং মানবতাবাদী সংস্কৃতিরও এক অসামান্য নিদর্শন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, ফারসি কবিতা কেবল আবেগ নয়; বরং একটি নৈতিক দর্শনেরও ধারক।

বাংলা সাহিত্যেও কবিতার মাধ্যমেই জাতির সাংস্কৃতিক চেতনা ও ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয়েছে, কবিগুরুর ‘জন গণ মন-অধিনায়ক’ থেকে নজরুলের ‘চল চল চল’ পর্যন্ত। ফলে কবিতা হয়ে দাঁড়ায় সময়ের সাক্ষী, সমাজের ভাষ্যকার এবং সংস্কৃতির জাগ্রত রক্ষাকবচ।

ধ্রুপদি ফারসি কাব্যের উদ্ভব ও ইতিহাস

ধ্রুপদি ফারসি কাব্যের সূচনা ঘটে ইসলামি যুগে, বিশেষত সামানীয় আমলে (৯ম-১০ম শতাব্দী)। আরব বিজয়ের (৭ম শতক) পর ফারসি ভাষা দীর্ঘদিন প্রশাসনিক ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণে থাকলেও, সামানীয় শাসকগণ ইরানি সংস্কৃতি ও ভাষার পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এর ফলে নব্য-ফারসি ভাষায় কাব্যরচনা শুরু হয়। প্রথমদিকে কাব্য ছিল রাজসভাকেন্দ্রিক–প্রশস্তিমূলক (মাদেহ), বীরগাথা ও নৈতিক উপদেশধর্মী। পরে ধীরে ধীরে গযল, কাসিদা, মসনভি প্রভৃতি কাব্যধারা বিকশিত হয়। ১০ম-১২শ শতাব্দীতে ফেরদৌসি, উনসুরি, ফাররুখি, মানুচেহরি প্রমুখের মাধ্যমে ফারসি কাব্য শক্ত ভিত লাভ করে। এরপর সুফি প্রভাবের ফলে আধ্যাত্মিক ও প্রেমধর্মী কাব্যের বিস্তার ঘটে। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন– রুমি, সা'দি ও হাফিয।[১৩]

ধ্রুপদি ফারসি কাব্যের প্রথম কবি ও প্রধান কবি হিসেবে সাধারণভাবে রুদাকিকে গণ্য করা হয়। তাকে ফারসি কাব্যের জনক বলা হয়। তিনি সামানীয় দরবারের রাজকবি ছিলেন। নব্য-ফারসি ভাষায় কাসিদা, গযল ও অন্যান্য কাব্যরীতির প্রাথমিক রূপ প্রতিষ্ঠা করেন। তার কাব্যে প্রকৃতি, মানবিক আবেগ ও জীবনদর্শনের সহজ ও সংগীতধর্মী প্রকাশ দেখা যায়। তিনি আরবি প্রভাবমুক্ত সরল ফারসি শব্দভাণ্ডার ব্যবহারে অগ্রণী ছিলেন। যদিও তার অধিকাংশ রচনা হারিয়ে গেছে, তবুও তার অবদান ফারসি সাহিত্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করে এবং পরবর্তী ধ্রুপদি কাব্যধারার ভিত্তি স্থাপন করে।[১৪]

সামানীয় ও গযনভি যুগে কাব্যচর্চা

ফারসি কাব্যচর্চার ইতিহাসে সামানীয় (৮১৯-৯৯৯ খ্রি.) ও গযনভি (৯৭৭-১১৮৬ খ্রি.) যুগকে একটি নবজাগরণের সময় বলা যায়। সামানীয় শাসকগণ ছিলেন ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক, যারা আরবি প্রভাবাধীন সাহিত্যিক পরিবেশে ফারসি ভাষার পুনরুজ্জীবনের পথ প্রশস্ত করেন। এ সময়েই প্রথম ধাপে গদ্য ও পদ্যে ফারসি সাহিত্য গড়ে ওঠে। সামানীয় দরবারের প্রধান কবি রুদাকি- কুরআন অনুবাদ থেকে শুরু করে নীতিশিক্ষামূলক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত কবিতা রচনা করেন।[১৫] রুদাকির একটি বিখ্যাত কবিতা,

بیا تا جهان را به بد نسپریم * به کوشش همه دست نیکی بریم.[١٦]

‘এসো, আমরা জগৎকে অশুভতায় না ভাসাই,
চেষ্টা করে সবাই মিলে শুভতার পথে যাই।,

গযনভি যুগে ফারসি কাব্যচর্চা আরও বিস্তৃত হয়। সুলতান মাহমুদ গযনভির দরবার ছিল কবি, পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের অন্যতম কেন্দ্র। এ সময়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল কবি ছিলেন আবুল কাসেম ফেরদৌসি, যিনি তার মহাকাব্য *শাহনামা*'- তে প্রায় ৬০,০০০ পঙক্তিতে পারসিক ইতিহাস, বীরত্বগাথা ও জাতীয়তাবাদ তুলে ধরেন। এ দুই যুগেই কাব্য ছিল সাংস্কৃতিক গৌরবের অভিব্যক্তি এবং পারসিক পরিচয়ের পুনর্নির্মাণের প্রধান মাধ্যম। এ সময়কার কাব্যশৈলী পরবর্তীকালে সুফিবাদ ও ধ্রুপদি ফারসি সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা রাখে।[১৭]

সেলজুক ও ইলখানীয় যুগে ধ্রুপদি রূপের পরিপক্বতা

ফারসি কাব্যশৈলীর ধ্রুপদি রূপ সেলজুক (১১শ-১৩শ শতক) ও ইলখানীয় (১৩শ-১৪শ শতক) যুগে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ দু'টি পর্বে ফারসি কবিতা শুধু রূপ ও ছন্দে নয়, ভাব ও অন্তর্নিহিত দার্শনিক গভীরতায়ও সমৃদ্ধ হয়। সেলজুক শাসকগণ ফারসি ভাষার ওপর আরবি আধিপত্য কমিয়ে আনেন এবং কবিদের রাজসভার গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত করেন। এ সময় গযল ও কাসিদার সৌন্দর্যমণ্ডিত ধারা গড়ে ওঠে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে ওমর খৈয়াম, আনসারি ও নিজামি গাঞ্জুবি উল্লেখযোগ্য। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত কেবল বিজ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টি মিলিয়ে নতুন এক ধারার সূচনা করে।[১৮] ওমর খৈয়াম বলেন,

می نوش که عمر جاودانی این است * خود حاصلت از دور جوانی این است.[١٩]

‘মদ পান করো, কারণ এ-ই অনন্ত জীবনের স্বাদ,
তোমার যৌবনের প্রকৃত ফসল এ-ই মাত্র।

ইলখানীয় যুগে ফারসি কাব্যে সুফিবাদের গভীর প্রভাব পড়ে। রুমি, সা'দি ও হাফিয এ পর্বে কাব্যকে আত্মদর্শন, প্রেম ও ইলাহি চেতনার বিশিষ্ট ভাষ্য হিসেবে গড়ে তোলেন। সা'দির *‘গুলিস্তান’* ও *‘বুস্তান’*, *হাফিযের গযল* এবং রুমির *‘মসনভি-ই মানভি’* ফারসি কাব্যের আধ্যাত্মিক রত্নভাণ্ডার হয়ে ওঠে। এ পর্বে ভাষার শৈল্পিকতা, ছন্দ, অলঙ্কার ও প্রতীকের ব্যঞ্জনা এমন এক শিখরে পৌঁছায়, যা ফারসি কাব্যকে চিরস্থায়ী ধ্রুপদি সৌন্দর্যের মর্যাদা দেয় এবং পরবর্তী সকল সাহিত্যিক ধারার জন্য মানদণ্ড স্থাপন করে।[২০]

তৈমূরীয় ও সাফাভি যুগে শৈল্পিক উৎকর্ষ

তৈমূরীয় (১৪শ-১৬শ শতক) ও সাফাভি (১৬শ-১৮শ শতক) যুগে ফারসি কাব্যশৈলী শিল্পসৌন্দর্যের পরিণত শিখরে পৌঁছে। তৈমূরীয় শাসকগণ সাহিত্য, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের মতো কাব্যিক সৃষ্টিকেও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত করেন। এ যুগে কবিতায় চিত্রকল্প, অলঙ্কার, গূঢ় প্রতীক ও ভাষার ব্যঞ্জনা আরও শৈল্পিক হয়। সমরখন্দ ও হেরাত ছিল এ নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র। এ সময়ের প্রধান কবিদের মধ্যে আব্দুর রহমান জামি সর্বাধিক খ্যাত। তার সুফি-প্রভাবিত কবিতা যেমন প্রেম ও দর্শনের মিশ্রণে মূর্ত, তেমনি ভাষার গীতিময়তায় অপূর্ব।[২১] মাওলানা জামি বলেন,

هر کسی را نتوان گفت که صاحب‌نظر است عاشق آن است که با یک نظرش کار بس است.[٢٢]

‘প্রত্যেকেই দৃষ্টিমান নয়;
প্রেমিক সেই, যার এক দৃষ্টিতেই সব সম্পন্ন।’

সাফাভি যুগে ফারসি কাব্যশৈলী আরও পরিশীলিত ও বুদ্ধিদীপ্ত হয়। কবিতায় ধর্মীয় অনুভব, শিয়া বিশ্বাস এবং সুফি তত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটে। গযল ও মসনভির পাশাপাশি হিকমত ভিত্তিক কবিতার উত্থান ঘটে। ভাষা হয় অলঙ্কারময়, বর্ণময় ও প্রতীকময়। এ যুগে কবিতা শুধু আবেগের বাহন নয়; বরং যুক্তি, দর্শন ও রাজনীতি পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়। ফলে ফারসি কবিতা হয়ে ওঠে এক শৈল্পিক ঐশ্বর্যের ধারক, যা পারস্য সভ্যতার গৌরবময় রূপকে দীর্ঘকাল ধরে ধারণ করে রেখেছে এবং পরবর্তী তুর্কি, উর্দু ও বাংলা সাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।[২৩]

কাব্যরীতির প্রকারভেদ ও শৈলী

ফারসি কাব্যধারা নানা ছন্দ ও গঠনে পরিপূর্ণ, যার মধ্যে কাসিদা, গযল, মসনভি, রুবাই, কিত'আ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি রীতির রয়েছে স্বতন্ত্র কাঠামো, বিষয়বস্তু ও আবেগপ্রবাহ।

গযল

গযল মূলত প্রেম, বিরহ ও আধ্যাত্মিক আকুলতার কাব্যিক রূপ। এটি দ্বিপদী শ্লোকে গঠিত, যেখানে প্রথম দ্বিপদীর উভয় পঙক্তিতে এবং পরবর্তী দ্বিপদীগুলোর দ্বিতীয় পঙক্তিতে একই রাদিফ থাকে।[২৪] গযলের মহান শিল্পী হাফিয বলেন,

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را * به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.[২৫]

'যদি সেই শিরাযের সূন্দরী হৃদয় জিতে নেয়,
তবে তার এক তিলের বিনিময়ে সমরকন্দ-বোখারা দান করি।'

কাসিদা

কাসিদা মূলত প্রশংসা বা নিন্দার উদ্দেশ্যে রচিত দীর্ঘ কবিতা- দরবারি পরিবেশে এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[২৬]

মসনভি

মসনভি দীর্ঘ কাহিনি ভিত্তিক ছন্দ, সাধারণত ধর্ম, নীতি বা প্রেমকাহিনি প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। রুমির *'মসনভি-ই মানভি'* এ ধারার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।[২৭]

রুবাই

রুবাই চার পঙক্তির কাব্যরীতি, যেখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙক্তিতে অন্ত্যমিল থাকে। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত।[২৮]

কিত'আ

কিত'আ হলো খণ্ডিত ছন্দবদ্ধ রচনা, যেখানে নির্দিষ্ট কোনো ভাবনা বা ব্যঙ্গ প্রকাশ পায়। এসব কাব্যরীতিই ফারসি সাহিত্যে বৈচিত্র্য ও শৈল্পিক প্রগাঢ়তা এনেছে এবং বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে।[২৯]

ছন্দ, উপমা, অলংকার, রূপক, রীতিশৈলী

ছন্দ, উপমা, অলংকার, রূপক ও রীতিশৈলী এগুলো ফারসি কাব্যশৈলীর নান্দনিক রূপ। ফারসি কাব্যশৈলীর সৌন্দর্য তার ছন্দ ও অলঙ্কারের নিপুণ ব্যবহারে নিহিত। ফারসি কবিতায় 'আরুজ' নামে একটি নির্দিষ্ট ছন্দপ্রণালী রয়েছে, যা মূলত আরবি উৎস থেকে গৃহীত। প্রতিটি কবিতার ছন্দ বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়- যেমন গযলে রাদিফ ও কাফিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সংগীতময় ধ্বনি বিন্যাস গড়ে ওঠে। উপমা (তাশবিহ) ও রূপক (ইস্তেয়ারা) ফারসি কবিতার হৃদয়। প্রেমিকের চোখ তুলনা হয় তরবারির ধার অথবা প্রিয়তমার গাল তুলনা হয় গোলাপে।[৩০] যেমন,

تو را در دیده خواهم داشت تا جان در بدن دارم
به جانان چون توان گفتن که جان من فدای تو.

'চোখে রাখব তোমায় যতক্ষণ প্রাণ আছে দেহে,
প্রিয়তম, কীভাবে বলি, এ প্রাণ তোমার তরে।'

অলংকার ব্যবহারে ফারসি কবিতা পরিণত শিল্পরূপ ধারণ করে। চিত্রকল্প, অনুপম উপমা, ধ্বনিগত সৌন্দর্য ও প্রতীকী ব্যঞ্জনা একে করে তোলে গভীর ও বহুস্তরীয়। 'গুল', 'বুলবুল', 'শরাব', 'মেহখানা' প্রভৃতি চিরায়ত প্রতীক রূপক অর্থ বহন করে, প্রেম, বিরহ, পরমানন্দ বা আধ্যাত্মিক উন্মোষের ইঙ্গিত দেয়। রীতিশৈলীর দিক থেকে ধ্রুপদি ফারসি কাব্যে খোরাসানি, ইরাকি ও হিন্দি ধারার স্বতন্ত্র প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। খোরাসানি ধারা (৯ম-১২শ শতক) ফারসি কাব্যের প্রাচীনতম শিল্পরীতি হিসেবে পরিচিত। এ ধারায় ভাষা সরল, বলিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ; ভাবপ্রকাশে স্পষ্টতা ও বাস্তবতার উপস্থিতি প্রধান। অলংকার প্রয়োগ সংযত, কল্পনা অপেক্ষাকৃত সরল ও জীবনঘনিষ্ঠ। রাজপ্রশস্তি, বীরত্ব, প্রকৃতি ও নৈতিক উপদেশমূলক বিষয় এ ধারার মুখ্য উপজীব্য। রুদাকি ও ফেরদৌসির কাব্যে এ রীতির স্বচ্ছতা ও দৃঢ়তা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ইরাকি ধারা (১২-১৫শ শতক) ফারসি কাব্যে নতুন সুকোমলতা ও ভাবগভীরতা সংযোজন করে। এ শৈলীতে ভাষা অধিক মাধুর্যমণ্ডিত, সংগীতধর্মী ও অলংকারবহুল। উপমা, রূপক, প্রতীক ও ব্যঞ্জনার ঘন প্রয়োগ কাব্যকে বহুমাত্রিক অর্থবহ করে তোলে। সুফি ভাবধারা, আধ্যাত্মিক প্রেম, অন্তর্দর্শন ও মানব-আল্লাহ সম্পর্ক এই ধারার কেন্দ্রে অবস্থান করে। রুমি, সা'দি ও হাফিযের কাব্যে ইরাকি শৈলীর কল্পনা, সুরেলা প্রকাশভঙ্গি ও গভীর অন্তর্নিহিত অর্থ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অপরদিকে হিন্দি ধারা (১৬-১৮শ শতক), যা মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে

বিকশিত, কল্পনার সূক্ষ্মতা ও জটিল ব্যঞ্জনায় অনন্য। এ ধারায় ভাষা অধিক রূপকনির্ভর ও দার্শনিক ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ; চিত্রকল্প সূক্ষ্ম, বিমূর্ত ও বহুস্তরীয়। ভাবপ্রকাশ কখনও দুর্বোধ্য ও বৌদ্ধিক জটিলতায় আবৃত থাকে, ফলে পাঠকের গভীর মনোযোগ দাবি করে। উর্ফি, কালিম কাশানি ও বিশেষত বেদিলের কাব্যে এ শৈলীর ঘন অলংকার, গভীর প্রতীকীতা ও তত্ত্বময় কল্পনার বিকাশ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ তিন ধারার ক্রমবিকাশে ফারসি কবিতা ভাষার মাধুর্য, ভাবের গভীরতা ও অলংকারের শিল্পসমন্বয়ে এক পরিণত ও সমৃদ্ধ সাহিত্যরূপ লাভ করেছে।[৩১]

সুফিবাদ ও ফারসি কাব্যশৈলী

ফারসি কাব্যশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর গভীর মরমি চিন্তা (اندیشهٔ عرفانی) ও আধ্যাত্মিক ভাষা (زبانِ معنوی / زبانِ روحانی), যা মূলত সুফি দর্শন (تصوف / عرفان اسلامی) দ্বারা প্রভাবিত। এ কাব্যে আল্লাহর সঙ্গে একাত্মতা (وحدت با خدا / وحدتِ وجود), আত্মার আর্তি (نالهٔ روح / فریادِ جان), প্রেমের রূপান্তর (تحولِ عشق / دگرگونیِ عشق) এবং পার্থিব মোহ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা (رهایی از دلبستگی‌های دنیوی / زهد) বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কবিতার প্রেম এখানে শুধু দেহজ নয়; বরং তা হয়ে ওঠে আত্মিক প্রেম (عشقِ روحانی) ও দিব্যচেতনা (آگاهیِ الهی / شعورِ قدسی) নির্ভর এক অভিজ্ঞান। রুমি, সানায়ি, আত্তার, জামি প্রমুখ সুফি কবিগণ তাদের রচনায় আল্লাহপ্রেম (عشقِ الهی) ও আত্মদর্শন (خودشناسی / معرفتِ نفس) -এর যে অভিব্যক্তি দিয়েছেন, তা ফারসি কবিতাকে এক অনন্য আধ্যাত্মিক উচ্চতায় (تعالیِ معنوی / اوجِ عرفانی) উন্নীত করেছে।[৩২] রুমি বলেন,

بشنو از نی چون حکایت می‌کند * از جدایی‌ها شکایت می‌کند.

'শুনো বাঁশির কথা, সে কী বলছে
বিচ্ছেদের বেদনা কীভাবে জানাচ্ছে।'

এ পঙক্তিতে 'নেই' বা বাঁশি আত্মার প্রতীক, যা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যথিত। এমন রূপক ব্যবহার ফারসি কবিতায় আল্লাহ-মানব সম্পর্ককে বিমূর্ত ভাষায় প্রকাশ করে।

আধ্যাত্মিক ভাষা (زبانِ معنوی / زبانِ عرفانی) হিসেবে মদ (می / شراب), সাকি (ساقی), মেহখানা (میخانه), রাত (شب), আলো (نور), পথ (راه / طریقت) ইত্যাদি রূপকে আধ্যাত্মিক অর্থ (معنای عرفانی / مفهومِ رمزی) আরোপ করা হয়। যেমন হাফিযের গযলে সাকি (ساقی) কেবল পান করানোর ব্যক্তি নয়; বরং আল্লাহর করুণা (لطفِ الهی / رحمتِ خداوندی) বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের (معرفتِ عرفانی / دانشِ الهی) প্রতীক (نماد / سمبل)। এ মরমি ভাষা (زبانِ عرفانی) ফারসি কাব্যকে শুধু সাহিত্যিক রূপ (صورتِ ادبی) নয়; বরং আত্মসন্ধানী (خودکاوی / خودشناسی) ও সাধনামূলক অভিজ্ঞতা (سلوکِ معنوی / تجربهٔ سلوکی)- তে পরিণত করেছে, যা আজও মানবমনের গভীরতা (ژرفای روحِ انسان) স্পর্শ করে।[৩৩]

রুমি, হাফিয ও আত্তারের প্রভাব

ফারসি কাব্যজগতের তিন অমর নক্ষত্র, মাওলানা রুমি, হাফিয শিরাযি ও ফরিদ উদ্দিন আত্তার শুধু ফারসি সাহিত্যের নয়; বরং বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য আসন অধিকার করে আছেন। তাদের কবিতা সুফি দর্শনের ব্যাখ্যাকে ভাষা, প্রতীক ও রূপকের মাধ্যমে এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে দেয়, যা আত্মা ও আল্লাহর সংলাপের মতো প্রতীয়মান হয়। রুমি তার মহা কাব্যগ্রন্থ *মসনভি-ই মানভি* ও *দিভান-ই শামস তাবরিজ*- এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক প্রেম, আত্মজিজ্ঞাসা ও আলোকপ্রাপ্তির পথে এক মহান দর্শন উপস্থাপন করেছেন।[৩৪] তিনি বলেন,

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود * جوینده عشق بی‌عدد خواهد بود.

'প্রেম চিরন্তন, শুরু থেকেই ছিল এবং অনন্তকাল থাকবে,
এ প্রেমের খোঁজে থাকবে অগণিত হৃদয়।'

হাফিয প্রেম ও মরমি দর্শনের সংমিশ্রণে গযলকে শিল্পের শিখরে নিয়ে যান। তার কবিতায় সাকি, মদ ও গোলাপ প্রতীক হয়ে ওঠে মুক্তি, জ্ঞান ও ঐশ্বরিক প্রেমের। তার কবিতার গূঢ়তা ইউরোপীয় রোমান্টিক কবিদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে।

আত্তার, বিশেষত মানতেকুত তাইর (পাখির সংলাপ) কাব্যে, আধ্যাত্মিক অন্বেষণকে রূপকথার মোড়কে বর্ণনা করেন। তার সত্তর হাজার পঙক্তির জীবনদর্শন রুমির ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। রুমি নিজেই বলেন, 'আত্তার রূহের শহর পেরিয়ে গেছেন, আমি তার পথিক মাত্র।'[৩৫]

এ তিন কবির সম্মিলিত প্রভাব ফারসি কবিতাকে শুধুই সাহিত্য নয়; বরং এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করেছে, যার রেশ আজও বিশ্বজুড়ে অনুভূত হয়।

ধ্রুপদি কবিগণের কাব্যশৈলী ও বৈশিষ্ট্য

ধ্রুপদি ফারসি কবিগণের কাব্যশৈলী শিল্পসৌন্দর্য, ভাষার মাধুর্য এবং ভাবের গভীরতার সমন্বয়ে গঠিত। তাদের কাব্যে অলংকারের সুনিপুণ প্রয়োগ, চিত্রকল্পের সৌন্দর্য এবং সংগীতধর্মী ছন্দ এক অনন্য নন্দনরূপ সৃষ্টি করে। উপমা, রূপক, প্রতীক ও ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঞ্জনা কাব্যকে বহুস্তরীয় অর্থ প্রদান করে। 'গুল', 'বুলবুল', 'মদ', 'সাকি', 'মেহখানা' প্রভৃতি চিরায়ত প্রতীক প্রেম, বিরহ, আল্লাহর অনুসন্ধান ও আধ্যাত্মিক উন্মেষের রূপক অর্থ বহন করে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে ধ্রুপদি কবিগণ মানবজীবনের নানা অনুভূতি–প্রেম, বেদনা, নৈতিকতা, বীরত্ব ও আধ্যাত্মিক সাধনা–কাব্যে রূপ দিয়েছেন। খোরাসানি ধারায় ভাষা সরল ও বলিষ্ঠ; ইরাকি ধারায় ভাবগভীরতা ও সুফি মরমিতা; আর হিন্দি ধারায় কল্পনার সূক্ষ্মতা ও রূপকের জটিলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রুমি, সা'দি, হাফিয, ফেরদৌসি, সানায়ি ও আত্তারের মতো কবিগণ তাদের নিজস্ব স্বর ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ফারসি কাব্যকে এক পরিণত, বহুমাত্রিক ও চিরন্তন শিল্পরূপে উন্নীত করেছেন।[৩৬]

ফেরদৌসীর বীরত্বগাঁথা

ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে আবুল কাসেম ফেরদৌসি (খ্রি.) এক অমর নাম, যিনি তার মহাকাব্য শাহনামা (রাজনামা)-র মাধ্যমে ইরানি জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অমর করে তুলেছেন। প্রায় ৬০,০০০ ছন্দবদ্ধ দ্বিপদীতে রচিত এ মহাকাব্য ইরানের পৌরাণিক, কিংবদন্তিভিত্তিক ও ঐতিহাসিক নায়কদের বীরত্বগাথার সংকলন। শাহনামা শুধু একটি বীরগাঁথা নয়, এটি ফারসি ভাষার উন্নয়ন, জাতির আত্মপরিচয় ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে এক অনন্য দলিল। ফেরদৌসি এ কাব্যগ্রন্থে ইরানের আর্য পূর্বপুরুষদের ইতিহাস তুলে ধরেছেন, যাদের মধ্যে রুস্তম, সিয়াব, জাল, কায়কাউস, এসফান্দিয়ার প্রমুখ বীর চরিত্র ইতিহাস ও মিথের মধ্যস্থলে অবস্থান করছে।[৩৭] একটি বিখ্যাত উদ্ধৃতি,

بسی رنج بردم در این سال سی * عجم زنده کردم بدین پارسی.[۳۸]

'ত্রিশ বছর অনেক কষ্ট করেছি আমি,
ফারসি ভাষায় পারস্যকে জীবিত করেছি।'

এ পঙক্তি ফেরদৌসির আত্মদৃষ্টি প্রকাশ করে, তার লক্ষ্য ছিল আরব শাসনের প্রভাবমুক্ত ফারসি সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। শাহনামার ভাষা অলংকারবহুল হলেও স্বচ্ছ, ছন্দ টানটান হলেও সহজবোধ্য। এতে ধর্মীয় প্রচারণার বদলে জাতীয় গৌরব, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফেরদৌসীর *শাহনামা* শুধু ফারসি সাহিত্যের নয়; বরং সমগ্র মানবসভ্যতার সাহিত্যিক ঐতিহ্যে এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত, যা আজও বীরত্ব, সাহস ও সংস্কৃতির গৌরবগাথা হিসেবে পাঠিত হয়।

ওমর খৈয়ামের দর্শন ও রুবাইয়াত

ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১ খ্রি.) ছিলেন একজন গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক, যিনি ফারসি সাহিত্যে বিশেষভাবে পরিচিত তার সংক্ষিপ্ত অথচ গভীরতা সম্পন্ন রুবাইয়াত বা চতুষ্পদী কবিতার জন্য। তার কবিতাগুলো মূলত জীবন, মৃত্যু, নিয়তি ও ভোগ-বঞ্চনার দার্শনিক অন্বেষণকে কেন্দ্র করে গঠিত। খৈয়ামের দৃষ্টিভঙ্গি একধরনের নিঃসঙ্গ জিজ্ঞাসা ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি বোধন।[৩৯] ওমর খৈয়ামের একটি প্রসিদ্ধ রুবাই,

می خور که به زیر گل بسی خواهی خفت * بی‌مونس و بی‌رفیق و بی‌همدم و جفت.[۴۰]

'পান কর মদ, কেননা একদিন গোরে ঘুমাবে,
বন্ধুহীন, সাথীহীন, প্রিয়হীন ও নিঃসঙ্গ।'

এ পঙক্তি শুধু ভোগবাদ নয়; বরং মানবজীবনের ক্ষণিকতা ও মৃত্যুর অনিবার্যতার উপলব্ধি। খৈয়ামের রুবাইয়াত একাধারে জাগতিক ভোগের আহ্বান এবং অস্তিত্ববাদী শূন্যতার একরকম দ্রোহ। তিনি প্রশ্ন করেন ধর্ম, স্বর্গ, পাপ ও পূণ্যের প্রচলিত ধারণা নিয়ে যা মধ্যযুগীয় ফারসি সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। তার রচনায় ইহজাগতিক বাস্তবতাই মুখ্য, যেখানে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও অতীতের অনুশোচনা ভুলে বর্তমানকে উপভোগ করার আহ্বান থাকে। খৈয়ামের রুবাইয়াত ইউরোপে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এডওয়ার্ড ফিৎজজেরাল্ড-এর ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে এক নতু মাত্রা যোগ করে। ওমর খৈয়ামের কবিতা প্রমাণ করে, কিভাবে সংক্ষিপ্ত চারটি পঙক্তি দিয়ে জীবনের গভীরতম প্রশ্নগুলো অন্বেষণ করা যায়।[৪১]

সা'দির নৈতিক ও শিক্ষামূলক কাব্য

শেখ সা'দি (১২০৮-১২৯১ খ্রি.), ফারসি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নীতিবিদ, যিনি তার কালজয়ী গ্রন্থ '*বুস্তান*' (উদ্যান) ও '*গুলিস্তান*' (ফুলবাগান)-এ নৈতিকতা, মানবতা ও বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা কাব্যিক ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। তার রচনার মূল উপজীব্য ছিল মানুষের চরিত্রগঠন, সদাচার, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পারস্পরিক সহানুভূতি। 'বুস্তান' মূলত গদ্যচ্ছন্দে রচিত উপদেশমূলক কাব্যগ্রন্থ, যেখানে ধর্মীয় ও মানবিক আদর্শের কথা উঠে এসেছে।[৪২] তিনি বলেন,

تو نیکویی کن و در دجله انداز * که ایزد در بیابانت دهد باز.[৪৩]

‘তুমি সৎকাজ করো আর তা দজলা নদীতে নিক্ষেপ করো,
আল্লাহ নিশ্চয়ই মরুভূমিতে তা তোমার সামনে এনে দেবে।’

এখানে নিঃস্বার্থ সেবার দর্শনই মুখ্য। অন্যদিকে, ‘*গুলিস্তান*’ অধিকাংশই গদ্যে রচিত, কিন্তু তা কাব্যিক ভাষায় অলংকৃত। এতে বিভিন্ন গল্প ও প্রবাদবাক্যের মাধ্যমে জীবনের বাস্তবতা, রাজার ন্যায়নীতি, দরবেশের বিনয়, দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি বিষয় চিত্রিত হয়েছে। তার বিখ্যাত মানবতাবাদী বাণী,

بنی‌آدم اعضای یک پیکرند * که در آفرینش ز یک گوهرند.[৪৪]

‘সমগ্র মানবজাতি একটি দেহের অঙ্গসম;
তারা একই উৎস থেকে সৃষ্ট।’

এ পঙক্তি আজও জাতিসংঘের ভবনে উৎকীর্ণ রয়েছে। সা’দির নৈতিক ও শিক্ষামূলক কাব্য শুধুমাত্র সাহিত্য নয়; বরং সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে নৈতিক দিক নির্দেশনার এক অপূর্ব অনুষঙ্গ, যা যুগে যুগে পাঠকের অন্তর জাগ্রত করে এসেছে।

হাফিযের সৌন্দর্য ও রহস্য

হাফিয শিরাযি (১৩২৫-১৩৮৯) ফারসি গযলের এক অনন্য উচ্চতায় আরোহনকারী কবি, যার কাব্যে এক সঙ্গে সৌন্দর্যের পূর্ণতা ও গভীর আধ্যাত্মিক রহস্যের মেলবন্ধন ঘটেছে। তার গযলগুলো প্রেম, রূপ, সাকি, মদ ও মাজারের প্রতীকের মাধ্যমে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা তৈরি করে, যেখানে পার্থিব প্রেম ও দেহজ আনন্দের আড়ালে থাকে এক অন্তর্লীন আধ্যাত্মিক সংকেত।[৪৫] হাফিয বলেন,

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را * به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.[৪৬]

‘যদি সেই শিরাযের তরুণী আমার হৃদয় জয় করে,
তাহার কপালের কালো তিলের বিনিময়ে আমি সমরকন্দ-বুখারা দান করতে রাজি।’

এ পঙক্তির রূপ ও অতিশয়োক্তি যেমন সৌন্দর্যের প্রকাশ, তেমনি তার পেছনে আছে প্রেমের আত্মসমর্পণ ও ধ্যানের গভীরতা। হাফিযের কবিতা সাধারণত দ্ব্যর্থবোধক, একই পঙক্তি পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে প্রেম, ধর্ম, রাজনীতি বা আধ্যাত্মিকতা অর্থে অনুধাবন করা যায়। এ রহস্যময়তা তাকে বিশ্বসাহিত্যে অনন্য করেছে। তার কাব্য এমনই বহুমাত্রিক যে ইরানে এখনো "ফাল-ই-হাফিয" নামে তার কাব্য থেকে দৈববাণী নেওয়া হয়। হাফিযের সৌন্দর্য কেবল ভাষায় নয়; তা তার ভাবনায়, ছন্দে, প্রতীকে ও রহস্যময় অভিব্যক্তিতে বিস্তৃত। তিনি রূপকে রসায়নে রূপান্তর করে হৃদয় ও চেতনার গভীরে ঢুকে যান। তার কবিতা তাই শুধু পাঠ নয়; বরং এ এক ধ্যান, এক অনুভব।

ফারসি কাব্যরীতির নন্দনতত্ত্ব ও ভাষাশৈলী

ফারসি কবিতা তার গভীর সৌন্দর্যচেতনা, সংবেদনশীল রূপক এবং বিমূর্ত ভাবধারার কারণে বিশ্বসাহিত্যে অনন্য স্থান অধিকার করেছে। এ কাব্যশৈলীতে সৌন্দর্য কেবল বাহ্যিক নয়; বরং তা অভ্যন্তরীণ, রূপ, গন্ধ, ধ্বনি, স্পর্শ ও স্বাদের মিলিত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত। ফারসি কবিগণ প্রেমিকের চোখ, চুল বা ঠোঁটের বর্ণনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যা ইন্দ্রিয়াত্মক কিন্তু ধ্যানমূলকও।[৪৭] একটি বিখ্যাত গযলে হাফিয বলেন,

بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم * فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.[৪৮]

‘এসো, ফুল ছড়াই ও সাগরে মদ ঢালি
আকাশের ছাদ চিরে এক নতুন ছক আঁকি।’

এ পঙক্তিতে রয়েছে রূপক, ফুল ছড়ানো ও সুরা পান করার আড়ালে আধ্যাত্মিক মুক্তির আভাস। সৌন্দর্য এখানে ধ্বংসের প্রতিবাদও। ফারসি কবিতায় চোখ=তীর, চুল=জাল, প্রেমিকা=সাকি, মদ=জ্ঞান, গুল=রূপ, এসব রূপক এক জটিল প্রতীকী ভাষা গঠনে সহায়তা করেছে। এ বিমূর্ততা পাঠকের ভাবনার জগতে প্রবেশের দ্বার খুলে দেয়।

শব্দচয়ন ও ব্যঞ্জনা

ফারসি কাব্যশৈলীর অন্যতম শক্তি হলো এর শব্দচয়ন এবং সেই শব্দের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত ব্যঞ্জনা। ফারসি কবিতায় শব্দ কেবল অর্থবাহক নয়; বরং একেকটি শব্দ একটি জটিল সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও শৈল্পিক পরিসরের বাহক। এ ভাষার কবিগণ শব্দের মাধ্যমে শুধু রূপ নয়; বরং আবেগ, বোধ ও আভাস প্রকাশ করেন, যা সরাসরি না বলে, ইঙ্গিতের মাধ্যমে অনুভব করানো হয়।[৪৯] কবি হাফিয বলেন,

دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را * دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. [৫০]

‘হৃদয় চলে যাচ্ছে আমার হাতছাড়া হয়ে, হে অন্তর্যামীগণ, আল্লাহর জন্য বলো,
হায়! যে গোপন রহস্য ছিল, তা আজ উন্মোচিত হয়ে পড়ছে।’

এখানে "دل" (হৃদয়) শুধু প্রেম নয়; বরং আধ্যাত্মিক আকর্ষণ, আকুলতা ও নিয়ন্ত্রণ হারানোর রূপকে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে "راز پنهان" (গোপন রহস্য) কথাটি দ্ব্যর্থবোধক, এটি প্রেম, ঈশ্বরচিন্তা কিংবা অন্তর্জগতের সংকটকে নির্দেশ করতে পারে। রুমি তার একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেন:

بشنو از نی چون حکایت می‌کند * از جدایی‌ها شکایت می‌کند. [৫১]

‘এ বাঁশির সুরে শোনো কী কথা বলা হচ্ছে,
এ যেন বিচ্ছেদেরই ক্রন্দন।’

এখানে বাঁশি (نی) শুধু একটি বাদ্যযন্ত্র নয়; বরং আত্মার প্রতীক। শব্দের ব্যঞ্জনায় আত্মার আল্লাহর থেকে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা ধ্বনিত হয়। ফারসি কবিতায় শব্দচয়ন সবসময়ই পরিমিত, ছন্দবদ্ধ এবং সুষম। প্রতিটি শব্দের ধ্বনি, বর্ণ ও প্রেক্ষাপট এমনভাবে গঠিত হয় যেন পাঠকের অনুভূতিতে সরাসরি অনুরণন সৃষ্টি করে। এ শব্দের সুনিপুণ ব্যবহার একধরনের সংগীতধর্মী সৌন্দর্য তৈরি করে, যা পাঠ বা শ্রবণে আত্মিক তৃপ্তি দেয়। ব্যঞ্জনার দিক থেকে, ফারসি কবিতা প্রায়শই বহুস্তর বিশিষ্ট, একই শব্দ বা বাক্য পঙক্তি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়, ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের কাছে ভিন্ন অর্থ বহন করে। এখানেই এ কাব্যশৈলীর গূঢ়তা ও মহত্ত্ব।

ফারসি কাব্যের আন্তসাংস্কৃতিক প্রভাব

ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসি কবিতার বিস্তার

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তার ভারতীয় উপমহাদেশে একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার নাম। ইসলামি শাসনের সূচনালগ্ন থেকেই উপমহাদেশে ফারসি ভাষা প্রশাসনিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যিক মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষত দিল্লি- সালতানাত এবং মুঘল সাম্রাজ্যের আমলে ফারসি ছিল রাজভাষা, যার ফলে এ ভাষায় বিপুলসংখ্যক সাহিত্যকর্ম ও কবিতা রচিত হয়। ১৩শ শতক থেকে শুরু করে ১৮শ শতক পর্যন্ত ফারসি কাব্যচর্চা ভারতবর্ষে এমন এক রূপ নেয়, যা ইরানি মূলধারার সঙ্গে স্থানীয় উপাদানের এক সৃজনশীল সংমিশ্রণ ঘটায়। ভারতীয় উপমহাদেশে কবিগণ শুধু ইরান থেকে আগত হননি; বরং এখানেই জন্মেছেন বহু গুণী ফারসি কবি। যেমন: আমির খসরু দেহলভি, বেদিল ও সারহিন্দি প্রমুখ।[৫২] আমির খসরু লিখেছেন,

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا * چه نیکوست و چه خوشبوست و چه زیباست خدایا.[৫৩]

‘সুবহান আল্লাহ! কী অপূর্ব এ প্রেম! কী অপূর্ব এ প্রেম!
এ যে কী সৌন্দর্যময়, কী সুবাসিত, কী মহিমাময় প্রেম।’

এ ধরনের ফারসি কবিতা ভারতীয় উপমহাদেশে সুফিবাদ, সংগীত ও লোকচর্চার সঙ্গে মিশে এক অনন্য সাংস্কৃতিক পরিসর সৃষ্টি করে। এছাড়াও, দরবারি কবিতা ও সুফি খানকাগুলোর মাধ্যমে ফারসি কাব্য ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। আওরঙ্গজেবের আমল পর্যন্ত ফারসি ছিল চিঠিপত্র, ইতিহাস রচনার ও শিক্ষার প্রধান ভাষা। মুঘল সম্রাট বাবর ও হুমায়ুন নিজেরাও ফারসি কবিতা রচনা করতেন। আকবরের সভাকবি ফাইজির কবিতা ভারতীয় রীতির সঙ্গে ফারসি গদ্য ও পদ্যরীতির এক উৎকর্ষ প্রকাশ করে। ফারসি কাব্যের প্রভাব পরবর্তীকালে উর্দু কবিতার জন্ম দেয় এবং বাংলা সাহিত্যেও তার ছায়া পড়ে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও মাইকেল মধুসূদনের রচনায়। ফলে বলা যায়, ফারসি কবিতা উপমহাদেশের সাহিত্যিক ভূদৃশ্যকে কেবল সমৃদ্ধই করেনি; বরং নতুন রীতিশৈলীরও প্রবর্তন ঘটিয়েছে।

উর্দু ও বাংলা সাহিত্যে ফারসির প্রভাব

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব শুধু ইরানেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ধারা হিসেবে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার বহু ভাষা ও সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশেষভাবে উর্দু ও বাংলা সাহিত্য এ ফারসি প্রভাবের ঐতিহাসিক স্বাক্ষর বহন করে। উর্দু সাহিত্য মূলত ফারসি ও স্থানীয় হিন্দুস্তানি ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত। উর্দুর শব্দভান্ডার, ছন্দ, অলংকার, এমনকি গযল ও কাসিদা সবই ফারসি কাব্যরীতির অনুকরণে গড়ে ওঠে। মির তকি মির, গালিব, ইকবাল প্রমুখ উর্দু কবি ফারসিতে যেমন পারদর্শী ছিলেন, তেমনি ফারসির শৈলীকে উর্দুতে প্রয়োগ করে নতুন সাহিত্যিক মানদণ্ড স্থাপন করেন।[৫৪] যেমন গালিব বলেছেন,

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے * بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے.[৫৫]

‘অগণিত আকাঙক্ষা, প্রতিটির জন্যই যেন প্রাণ ত্যাগ হয়,
অসংখ্য আশা পূর্ণ হলো, তবুও মনে হলো কম হলো।’

এ দ্ব্যর্থতা ও গূঢ় ব্যঞ্জনার শৈলী সরাসরি ফারসি গযলের ধারাবাহিকতা। তুর্কি সাহিত্য, বিশেষত উসমানি যুগের কবিতায় ফারসি কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। ফারসি শব্দ, বাক্যগঠন ও চিত্রকল্প ব্যবহার করে *দিভান* কাব্যরীতি গড়ে ওঠে। উসমানি কবি ফুজুলি ফারসি গযলের ছাঁচে প্রেম ও সুফিবাদ নিয়ে কাব্য রচনা করেন।

বাংলা সাহিত্যতেও ফারসির প্রভাব ছিল বহুমাত্রিক। মুসলিম কবিদের হাতে বাংলা সাহিত্যে ফারসি শব্দ, ভাব ও রূপক প্রবেশ করে। ১৭-১৮ শতকে রচিত শোভন কাব্য বা ইসলামি ধর্মকাব্যে ফারসির প্রভাব রয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যভাষ্যেও ফারসি ছায়া লক্ষ্য করা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম বহু ফারসি শব্দ ও প্রতীক ব্যবহার করে বাংলা কবিতাকে এক নতুন ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করেছেন। যেমন,

‘গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান![৫৬]

এখানে সাম্য ও মহত্ত্বের যে ধারণা, তা সুফি-ফারসি ভাবনারই অনুরণন। ফারসি সাহিত্য শুধু একটি ভাষার ঐতিহ্য নয়, এটি একটি বিস্তৃত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার রূপ, যা বহু ভাষাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে তাদের স্বতন্ত্র শৈলীর বিকাশে সহায়ক হয়েছে।

অনুবাদ ও সাহিত্য-আদান প্রদান

ফারসি ভাষা শুধু একটি সাহিত্যিক সংরক্ষণ ভাণ্ডার নয়; বরং একটি কার্যকর সাংস্কৃতিক সেতু বন্ধনও বটে। অনুবাদ কার্য ও সাহিত্য-আদান-প্রদানের মাধ্যমে ফারসি ভাষা বহু সভ্যতা ও সাহিত্যধারার সঙ্গে এক আন্তসংলাপের বন্ধন গড়ে তুলেছে। এ অনুবাদিক চর্চা বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিক ঐশ্বর্যকে পারস্পরিকভাবে সমৃদ্ধ করেছে, বিশেষত আরবি, তুর্কি, সংস্কৃত, বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের সঙ্গে ফারসির গভীর সংযোগ স্থাপন করেছে। ইসলামি স্বর্ণযুগে আরবি ভাষার দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্ব যখন ফারসিতে অনূদিত হচ্ছিল, তখন ফারসি লেখকেরা কেবল শব্দান্তর করতেন না; বরং তার ব্যাখ্যা, ব্যঞ্জনা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণেও নতুন অর্থবোধ যোগ করতেন। একইভাবে, ফারসি সাহিত্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ রচনা যেমন, সা'দির *গুলিস্তান*, *বুস্তান*, রুমির *মসনভি-ই মানবি* কিংবা ফেরদৌসির *শাহনামা*, অনূদিত হয়েছে উর্দু, তুর্কি, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায়। বাংলা ভাষায় ফারসি সাহিত্য অনুবাদের দীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। নবাবী আমলে বহু কবিতা, বিশেষ করে সুফি রচনাবলি ফারসি থেকে বাংলায় অনূদিত হয় এবং বঙ্গীয় সমাজে ধর্মীয়-দর্শন ও কাব্যিক সৌন্দর্য বিস্তার করে। কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফারসি কবিতার ভাব ও গঠন অনুকরণ করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা আনেন।[৫৭] একটি বিখ্যাত ফারসি কবিতা রুমির,

هر کسی از ظن خود شد یار من * از درون من نجست اسرار من.[৫৮]

‘প্রত্যেকেই তার নিজস্ব ধারণা থেকে হয়েছে আমার সহচর,
কিন্তু কেউ খুঁজে দেখেনি আমার হৃদয়ের গোপন কথা।’

এ পঙক্তিগুলো যেমন আধ্যাত্মিক অন্তদর্শনের দিক থেকে গভীর, তেমনি অনুবাদে এর ভাব ও ব্যঞ্জনা ধরে রাখা এক চ্যালেঞ্জ। তবুও দক্ষ অনুবাদকগণ এ কবিতার ভাবানুবাদে সাহিত্য ও দর্শনের মেলবন্ধন তৈরি করেছেন। ফারসি কাব্যের অনুবাদ কেবল ভাষান্তর নয়; বরং এটি হলো একটি সংস্কৃতির অন্তদর্শনের পুনর্জন্ম। এ অনুবাদিক আদান-প্রদান আমাদেরকে বিশ্বসাহিত্যের বৃহত্তর বোধে উপনীত করে।

আধুনিককালে ধ্রুপদি কাব্যশৈলীর প্রতিফলন

আধুনিক কবিদের রচনায় ধ্রুপদি রীতির সুস্পষ্ট অনুরণন পরিলক্ষিত হয়। ফারসি কাব্যধারায় আধুনিকতার আগমন সত্ত্বেও ধ্রুপদি রীতির প্রভাব এখনো গভীরভাবে বিদ্যমান। বিশ শতকের শুরুতে পাশ্চাত্য সাহিত্য, সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও নবনির্মাণবাদী ভাবধারার প্রভাবে ফারসি কবিতায় নতুন ছন্দ, মুক্তকবিতা ও সামাজিক-রাজনৈতিক ভাষ্য প্রবেশ করলেও, ধ্রুপদি কাব্যরীতির কাঠামো, অলংকারপ্রবণতা এবং প্রতীকধর্মী ভাবচেতনার শিকড় সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়নি। গযল, রুবাই ও মসনভির ঐতিহ্যবাহী বিন্যাস, রূপক-প্রতীকের ব্যঞ্জনা এবং সুফিবাদী ভাবধারার সূক্ষ্ম উপস্থিতি আধুনিক কাব্যেও নতুন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। নিমা ইউশিজ ছন্দ ও গঠনে বিপ্লব ঘটিয়ে আধুনিক ফারসি কবিতার সূচনা করলেও, কাব্যের আবেগঘনতা ও প্রতীকচেতনায় তিনি ধ্রুপদি ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করেননি। একইভাবে পারভিন এতেসামি তাঁর নৈতিক ও শিক্ষামূলক কাব্যে ধ্রুপদি কাসিদা ও উপদেশধর্মী ধারার পুনরুজ্জীবন ঘটান। মাহদি আখাভান সালেস

প্রাচীন খোরাসানি গাম্ভীর্য ও পৌরাণিক চিত্রকল্পকে আধুনিক সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেন। সোহরাব সেপেহরি আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃতিচেতনা ও বিমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমে ইরাকি ধারার সুফি-মরমি ব্যঞ্জনাকে আধুনিক রূপ দেন। কায়সার আমিনপুন বিপ্লবোত্তর কাব্যে ধ্রুপদি গযলের সংগীতধর্মিতা ও প্রতীকময় ভাষাকে সমসাময়িক চেতনার সঙ্গে সমন্বিত করেন। অপরদিকে শাহরিয়ার ঐতিহ্যবাহী গযলরীতিকে আধুনিক অনুভব ও মানবিক বেদনার সঙ্গে যুক্ত করে ধ্রুপদি ও আধুনিকতার এক সার্থক সেতুবন্ধন নির্মাণ করেন। অতএব, আধুনিক ফারসি কবিতা বাহ্যিকভাবে রূপ ও কাঠামোয় নবীনতা গ্রহণ করলেও, তার অন্তর্নিহিত নন্দনচেতনা, প্রতীক-ব্যঞ্জনা ও আধ্যাত্মিক অনুরণনে ধ্রুপদি কাব্যশৈলীর গভীর উত্তরাধিকার আজও সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।[৫৯] নিমার একটি কাব্যাংশ,

تو را من چشم در راهم * شباهنگام... .[۶۰]

‘আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করি
রাত্রি গভীর হলে...’

এ কবিতার মধ্যে আধুনিক প্রেম, প্রতীক্ষা ও সময়ের প্রবাহ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে রুমির ধ্যনমগ্ন প্রতীক্ষার ব্যঞ্জনা। ফাররুখি ইয়াযদি, সিমিন বহবাহানি এবং শাহরিয়ার প্রমুখ আধুনিক কবির লেখনীতে গযল-ভাষার অনুরণন পাওয়া যায়। বিশেষ করে শাহরিয়ারের বিখ্যাত গযল آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ধ্রুপদি প্রেম ও অপেক্ষার অনবদ্য প্রতিফলন। একদিকে যেমন আধুনিক কবিগণ ছন্দের নিয়ম ভেঙেছেন, অন্যদিকে তারা ভাষার ঐতিহ্যিক ব্যঞ্জনা ও ধ্রুপদি কাঠামোর সাথে এক ধরণের মিতালি বজায় রেখেছেন। এর ফলে ফারসি কবিতা হয়ে উঠেছে এক প্রাচীন-নতুনের সৃজনশীল মিলনভূমি, যেখানে রুমির আত্মা ও নিমার দৃষ্টি একসঙ্গে বাস করে। এভাবে ধ্রুপদি রীতি কেবল অতীতের নিদর্শন নয়; বরং আধুনিক কাব্য-প্রতিসৃষ্টির এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে ফারসি কবিতায় আজও জীবন্ত।

সাহিত্যে উত্তরাধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন

উত্তরাধুনিকতাবাদ (Postmodernism) বিশ শতকের মধ্যভাগে উদ্ভূত একটি সাহিত্য ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা আধুনিকতার যুক্তিবাদ, একক সত্য এবং ঐতিহ্যকেন্দ্রিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে। সাহিত্যে উত্তরাধুনিকতা বহুত্ব, অনিশ্চয়তা, আংশিকতা ও ভাষার খেলা, এ ধারণাগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়। এ ধারার আলোকে ফারসি সাহিত্যের মূল্যায়নে দেখা যায়, বহু ধ্রুপদি ও আধুনিক কবিতা নতুন দৃষ্টিতে পাঠযোগ্য হয়ে ওঠে। উত্তরাধুনিক পঠনপদ্ধতি অনুসারে, একটি কবিতার একাধিক অর্থ থাকতে পারে, নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যায় তাকে আবদ্ধ করা যায় না।[৬১] যেমন হাফিযের কবিতা,

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی * از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی.[۶۲]

‘প্রেমিকের গলি থেকে আসছে নওরোজের বাতাস,
এ বাতাস থেকে যদি সাহায্য চাও, তবে হৃদয়ের প্রদীপ জ্বালাতে পারো।’

এ কবিতা প্রেম, প্রকৃতি ও নবজাগরণকে নির্দেশ করলেও, উত্তরাধুনিক পাঠে এটিকে ধর্মনিরপেক্ষ আত্মনির্মাণ, ভাঙা সময়ের নিছক প্রতীকী খেলা হিসেবেও দেখা যেতে পারে। এ ধরনের বহুব্যাখ্যাগত গঠনই উত্তরাধুনিকতার মূল শক্তি। উত্তরাধুনিকতার আলোকে রুমির কবিতাও শুধুই সুফি ভাবনা বিশিষ্ট নয়; বরং পাঠক ও পাঠের দ্বন্দ্ব, ভাষার সীমাবদ্ধতা এবং অর্থের অবিচল অনিশ্চয়তা সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। তার বিখ্যাত কবিতা,

این همه گفتیم لیک اندر بسیج * بی‌عنایات خدا هیچیم هیچ.[۶۳]

আমরা এত কিছু বললাম, তবু সংক্ষেপে (মূল কথায়) বলতে গেলে,
আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া আমরা কিছুই নই, একেবারেই কিছুই নই।’

এখানে ভাষার ব্যর্থতা ও নীরবতার শক্তিকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা উত্তরাধুনিক ভাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ফারসি কবিতা আর কেবল ঐতিহ্য বা নৈতিক বার্তার বাহক নয়; বরং একটি মুক্ত পাঠযোগ্য ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে পাঠক নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ভাষাবোধ নিয়ে অর্থ নির্মাণে অংশ নেন। উত্তরাধুনিকতা ফারসি কাব্যরীতিকে এভাবে বহুবিচিত্র ব্যাখ্যার দরজা খুলে দিয়েছে।

ঐতিহ্য ও প্রভাবের উত্তরাধিকার

ফারসি কাব্যশৈলীর ঐতিহ্য শুধু ইরানি সংস্কৃতির গভীরতার পরিচায়ক নয়; বরং সমগ্র ইসলামি ও পার্শ্ববর্তী সাহিত্যে একটি শক্তিশালী প্রভাবশালী উত্তরাধিকার হিসেবে বিবেচিত। এ উত্তরাধিকার যুগে যুগে কবিদের মাধ্যমে নতুন রূপ, ভাবনা ও প্রেক্ষাপটে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ধ্রুপদি কাব্যের ছন্দ, অলংকার এবং আধ্যাত্মিক গভীরতা আধুনিক কাব্যে প্রতিফলিত হয় এবং এর সৌন্দর্য ও গভীরতা রক্ষা পায়। ফারসি কবিতা যেমন ফেরদৌসির *শাহনামা* থেকে শুরু করে রুমি, হাফিয ও সা'দির গযল পর্যন্ত নানা ধারার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধারক। এ সাহিত্যিক উত্তরাধিকার বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন ভারতীয়

উপমহাদেশ, তুর্কি, উর্দু ও আরবি সাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষত, ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল শাসনামলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য রাজকীয় সভার ভাষা হিসেবে প্রবল প্রভাব ফেলে, যা বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।[৬৪] হাফিযের একটি বিখ্যাত গযল থেকে পঙক্তি,

الا يا ايها الساقى ادر كأساً و ناولها * كه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكل‌ها.[٦٥]

‘হে সাকি! কাপে মদ ঢাল এবং দাও,
‘প্রেম প্রথমে সহজ মনে হয়, কিন্তু পরে কষ্ট দেয় অনেক।’

এ গযলে প্রেমের মায়াজালে আবদ্ধ দুঃখ-সুখের কথা তুলে ধরা হয়েছে, যা আধুনিক কবিদের মধ্যেও বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে। ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার শুধুমাত্র শৈল্পিক নয়; বরং তা একধরনের সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক উত্তরাধিকারও বটে। প্রতিটি নতুন কবি পূর্বপুরুষদের ভাবনাকে গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে নিজস্ব চিন্তা ও আধুনিকতা মিশিয়ে একটি নতুন সাহিত্যিক পরিচয় গড়ে তোলে। এ ধারাবাহিকতা ফারসি কাব্যের বহুমাত্রিকতা ও বিশ্বজনীনতাকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলশ্রুতিতে, ঐতিহ্য ও প্রভাবের উত্তরাধিকার ফারসি সাহিত্যের প্রাণঘাতী শক্তি হিসেবে বর্তমানেও কবিদের চিন্তাধারা ও সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

ধ্রুপদি ফারসি কাব্যরীতির সামগ্রিক মূল্যায়ন

ধ্রুপদি ফারসি কাব্যশৈলী সাহিত্যের এক অসাধারণ ঐতিহ্যবাহী রূপ, যা কেবল ভাষার সৌন্দর্যই নয়; বরং দার্শনিক গভীরতা ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির নিদর্শন। হাজার বছরের ইতিহাসে এ রীতির কবিগণ তাদের ছন্দ, অলংকার ও রূপকশৈলীর মাধ্যমে মানব জীবনের প্রেম, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা এবং দার্শনিক অনুসন্ধানকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফারসি কবিতার ধ্রুপদি রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার ছন্দবদ্ধতা ও ছন্দনৈপুণ্য। গযল, মসনভি, কাসিদা ও রুবাইয়ের মতো বিভিন্ন কব্যরূপের নিখুঁত ছন্দ ও কাঠামো কাব্যের সুর ও ছন্দকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেয়। এ ছন্দের সঙ্গে যুক্ত হয় বিমূর্ত ও অর্থবহ উপমা, রূপক ও অলংকার, যা পাঠকের মনকে স্পর্শ করে গভীর ভাবনার জগতে প্রবেশ করায়। রুমির মসনভি থেকে একটি পঙক্তি,

هر كسى از ظن خود شد يار من * از درون من نجست اسرار من.[٦٦]

‘প্রত্যেক নিজস্ব ধারণায় বন্ধু হলো,
কিন্তু আমার অন্তরের রহস্য কেউ খুঁজে দেখলো না।’

এ পঙক্তিতে ধ্রুপদি ফারসি কবিতার বহুমাত্রিক অর্থ ও পাঠের গভীরতা প্রকাশ পায়। এটি দেখায় কিভাবে একই কবিতা বিভিন্ন পাঠক ভিন্ন দৃষ্টিতে বুঝতে পারেন।

ধ্রুপদি রীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভাবনার অন্তর্ভুক্তি। রুমি, সা'দি ও আত্তারের মতো কবিগণ কেবল প্রেম ও প্রকৃতির বর্ণনা করেননি, তারা মানুষের আত্মার জগৎ, জীবন-মৃত্যু, ও পরলোকীয় সত্য অনুসন্ধান করেছেন। অবশেষে, ধ্রুপদি ফারসি কাব্যরীতি শুধু ঐতিহাসিক নিদর্শন নয়; বরং আধুনিক কবিতার জন্য এক ধ্রুপদি পথ প্রদর্শক। এটি ফারসি সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে অবিচ্ছেদ্য এবং বিশ্বসাহিত্যের এক অনন্য সাংস্কৃতিক ধারা হিসেবে রয়ে গেছে।

ভবিষ্যৎ গবেষণার দিগন্ত

ফারসি কাব্যশৈলীর ইতিহাস ও সমৃদ্ধি অন্বেষণ করার পরবর্তী ধাপ হলো এর ভবিষ্যৎ গবেষণার দিগন্ত প্রসারিত করা। ধ্রুপদি কাব্যশৈলীর বিভিন্ন দিক যেমন ভাষাশৈলী, অলংকার, আধ্যাত্মিকতা ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে আধুনিক গবেষণায় নানা নতুন প্রশ্ন ও অনুসন্ধান শুরু হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ শৈলীর অন্তর্নিহিত রহস্য, বহুমাত্রিকতা এবং এর আধুনিকতায় প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে গভীর সমীক্ষা প্রয়োজন। ফারসি কবিতার বহুমাত্রিক অর্থের কারণে এটি একটি চমৎকার গবেষণার ক্ষেত্র। বিশেষ করে ভাষার বহুবিধ ব্যবহার ও প্রতীকবাদের বিশ্লেষণ, যা আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে হাফিযের এ গযলটি,

دل مى‌رود ز دستم، صاحب دلان خدا را * دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا.[৬৭]

‘হৃদয় চলে যাচ্ছে আমার হাত থেকে, হৃদয়বানদের কাছে আল্লাহর কাছে,
দুঃখিত, যে গোপন রহস্য প্রকাশ পাবে অবশেষে।’

এ পঙক্তিতে নিহিত গভীর আধ্যাত্মিকতা ও রহস্যের জটিলতা আধুনিক মনস্তত্ত্ব, দার্শনিক বিশ্লেষণ ও সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের জন্য একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্র।

ভবিষ্যৎ গবেষণার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ফারসি কাব্যের আধুনিক রূপান্তর এবং বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে এর সংযোগ। কিভাবে আধুনিক কবিরা ধ্রুপদি শৈলীর উপাদান গ্রহণ করে নতুন অর্থ ও সমাজবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে তা ব্যাখ্যা করতে পারে, এটি একটি গবেষণার উত্তেজনাপূর্ণ বিষয়। এছাড়া, প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে ডিজিটাল সাহিত্য ও অনলাইন মাধ্যমেও ফারসি কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যাচাই করা দরকার। অতএব, ফারসি কাব্যরীতির ঐতিহ্যকে আধুনিকতার সাথে সংযুক্ত করে তার বহুমাত্রিক প্রভাব ও নান্দনিক মূল্যায়নের জন্য ভবিষ্যতে বহুমুখী গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। এ গবেষণা শুধুমাত্র সাহিত্যের জন্য নয়; বরং সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

উপসংহার

ফারসি কাব্যশৈলীর ধ্রুপদি ধারা কেবল একটি সাহিত্যিক রীতি নয়; বরং তা একটি সভ্যতা-নির্মাণকারী নান্দনিক ও বৌদ্ধিক আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি। এর শিকড় যেমন প্রাক-ইসলামি সংস্কৃতিতে প্রোথিত, তেমনি ইসলামি সুফিবাদ, দর্শন এবং নৈতিক বোধ এ কাব্যরীতিকে দিয়েছে একটি গভীর ব্যঞ্জনাময় রূপ। প্রেম, বিরহ, জ্ঞানান্বেষণ ও আত্মদর্শনের মতো চিরন্তন মানবিক অনুভূতিকে যে সাবলীলতায় ফারসি কবিতা উপস্থাপন করে-তা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এ প্রবন্ধে ধ্রুপদি ফারসি কবিতার গঠন, ছন্দবিন্যাস, রূপকশৈলী ও দার্শনিক অন্তর্নিহিতার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে যে, এটি কেবলমাত্র সৌন্দর্য প্রকাশের একটি মাধ্যম নয়; বরং সমাজ, ধর্ম ও মানবমনের গহীনতম প্রশ্নগুলোরও উত্তর সন্ধান করে। হাফিযের গযল, রুমির মসনভি কিংবা ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতে প্রতিটি কাব্যরূপেই দেখা যায় একটি শৈল্পিক ধ্যান এবং অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান। ফারসি কাব্যশৈলীর এ ধ্রুপদি ধারা পরবর্তী যুগের উর্দু, তুর্কি, বাংলা ও পশ্চিমা সাহিত্যেও গভীর ছাপ ফেলেছে, যা একে শুধু আঞ্চলিক নয়; বরং বিশ্বনন্দিত কাব্যঐতিহ্যে পরিণত করেছে। এ উত্তরাধিকার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়-ভাষা ও সংস্কৃতির সীমারেখা অতিক্রম করে সত্যিকারের সাহিত্যই মানুষের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ আব্দুস সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ১-২।

২ আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমী, *মসনবী শরীফ*, আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব (অনু.) (ঢাকা: সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩৯।

৩ জাহান মুলক খাতুন, *দিভানে জাহান*, *https://ganjoor.net/jahan/divan/ghazal/sh9*

৪ খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ হাফিয শিরাযি, *দিভানে হাফিয*, মোহাম্মদ কাযভিনি ও ড. কাসেম গনি (সম্পা.), (তেহরান: এন্তেশারাতে আসাতির, ১৩৭৪ হি.শা. / ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ.।

৫ শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার নিশাবুরি, *দিভান আত্তার*, *https://ganjoor.net/search?s=%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87&es=1&author=9*

৬ মির্যা আসাদুল্লাহ বেগ খান গালিব, *দিভান গালিব*, *https://ganjoor.net/ghaleb/divan/ghazal/sh1*

৭ কাসেম আনোয়ার, *দিভানে কাসেম*, *https://ganjoor.net/ghasem/divan/ghazal/sh105*

৮ ড. আহ্মাদ তামিমদারি, *কেতাবে ইরান তারিখে আদাবে পারসি মাকতাবহা, দোরেহা, সাবকহা ওয়া আনভা'য়ে আদাবি* (তেহরান: এন্তেশারাতে বাইনুল মেলালি আল হুদা, ১৩৭৯ হি.শা./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৫২-৫৩।

৯ *মসনবী শরীফ*, পৃ. ৩৪।

১০ *কেতাবে ইরান তারিখে আদাবে পারসি মাকতাবহা, দোরেহা, সাবকহা ওয়া আনভা'য়ে আদাবি*, পৃ. ৭১।

১১ মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন, *ইরানের কবি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ খ্রি.), ভূমিকা-পৃ. ১২-১৩।

১২ শেখ সা'দি, *গুলিস্তানে সা'দি* *https://ganjoor.net/search?s=%D8%A8%D9%86%DB%8C+%D8%A2%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C+&es=1&author=7*

১৩ *কেতাবে ইরান তারিখে আদাবে পারসি মাকতাবহা, দোরেহা, সাবকহা ওয়া আনভা'য়ে আদাবি*, পৃ. ৬৪-৬৫।

১৪ *ইরানের কবি*, পৃ. ১-৩।

১৫ ড. মো. জাওয়াদ মাশকুর, *তারিখে ইরান জামিন* (তেহরান: এন্তেশারাতে এশরাকি, ১৩৭২ হি.শা./ ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৮৩।

১৬ ড. মোহাম্মদ জাফর ইয়াহাক্কি, *কুল্লিয়াতে তারিখে আদাবিয়াতে ফারসি* (তেহরান: সাজেমানে মোতালেয়ে ওয়া তাদবিনে কুতুবে উলুমে ইনসানি দানেশগাহহা (সামত), ১৩৯০ হি.শা./ ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৯।

১৭ মাহদি ওলি মোহাম্মাদিয়ান, *তারিখে ইরান* (তেহরান: নাশরে রোজগার, ১৩৯৪ হি.শা./২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৯৩-৯৪।

১৮ *তদেব*, পৃ. ২০১-২০২।

১৯ ওমর খৈয়্যাম, *রুবাইয়াত*, *https://ganjoor.net/search?s=%22%D9%85%DB%8C++%D9%86%D9%88%D8%B4+%DA%A9%D9%87%22&es=1&author=3&cat=0*

২০ *তারিখে ইরান*, পৃ. ২৩০-২৩১।

২১ ড. আব্দুল্লাহ রাযি, *তারিখে কামেলে ইরান* (তেহরান: চাপখানেয়ে ইকবাল, ১৩৭৩ হি.শা./ ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৩৬৩।

২২ মাওলানা আব্দুর রহমান জামি, *হাফত আওরাঙ্গ*, *https://ganjoor.net/search?s=%D9%87%D8%B1+%DA%A9%D8%B3%DB%8C+&es=1&author=24*

২৩ *তারিখে ইরান*, পৃ. ২৫৯-২৬০।

[২৪] সাইয়্যেদ মোহাম্মদ রাসতগু, *এরফান দার গযলে ফারসি*, (তেহরান: শেরকাতে এন্তেশারাতে এলমি ওয়া ফারহাঙ্গ, ১৩৮৩ হি.শা./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩।

[২৫] খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ হাফিয শিরাযি, *দিভানে হাফিয*, সাইয়েদ সাদেক সাজ্জাদি ও আলি বাহরামিয়ান (সম্পা.), (তেহরান: শেরকাতে এন্তেশারাতে ফেকের রুজ, ১৩৭৯ হি.শা. / ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩৮।

[২৬] *কেতাবে ইরান তারিখে আদাবে পারসি মাকতাবহা, দোরেহা, সাবকহা ওয়া আনভা'য়ে আদাবি*, পৃ. ১৭৯-৮০।

[২৭] *তদেব*, পৃ. ২৩০।

[২৮] *তদেব*, পৃ. ১৬৩।

[২৯] *তদেব*, পৃ. ২৩৬।

[৩০] *তদেব*, পৃ. ১৩৬।

[৩১] ড. মাহদি দাহবাশি ও ড. সাইয়েদ আলি আসগর মির বাকেরি ফারদ, *তারিখে তাসাউফ*, ১ম খণ্ড, (তেহরান: এন্তেশারাতে সাজেমানে মোতালেয়ে ওয়া তাদবিনে কুতুবে উলুমে ইনসানি দানেশগাহহা (সামত), ১৩৯৪ হি.শা./ ২০১৫ খ্রি.), পৃ.। পৃ. ১৭১।

[৩২] A. J. Arberry, *Classical Persian Literature* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1958.), p. 165.

[৩৩] ড. মো. হাসান হায়েরি, *এরফান ওয়া তাসাউফ* (তেহরান: এন্তেশারাতে বাইনুল মেলালী আল হুদা, ১৩৮২ হি.শা./ ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৫-১৬।

[৩৪] মোস্তাফা বাদকুবেই হাজাভেয়ি, *জেন্দেগিয়ে আত্তার* (তেহরান: চাপখানেয়ে হাদিস, ১৩৭২ হি.শা./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৮।

[৩৫] ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরান: এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, ১৩৬৯ হি.শা. / ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৩০৭-০৮।

[৩৬] *কেতাবে ইরান তারিখে আদাবে পারসি মাকতাবহা, দোরেহা, সাবকহা ওয়া আনভা'য়ে আদাবি*, পৃ. ৮৫।

[৩৭] *ইরানের কবি*, পৃ. ৩১-৩২।

[৩৮] আবুল কাসেম ফেরদৌসি, *শাহনামা*, *https://ganjoor.net/search?s=%D8%A8%D8%B3%DB%8C+%D8%B1%D9% 86%D8%AC+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%B3%DB%8C&es=1&author=4&cat=0*

[৩৯.] ড. তাওফিক হা. সোবহানি, *তারিখে আদাবিয়াত* ২ (তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে পয়ামে নূর, ১৩৭৫ হি.শা./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১২৯-১৩০।

[৪০] ওমর খৈয়্যাম, *রুবাইয়াত* *https://ganjoor.net/search?s=%D9%85%DB%8C%E2%80%8C+%D8%AE%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%87+%22&es=1&author=3&cat=0*

[৪১] *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ১৫৭-৫৮।

[৪২] আল্লামা শেখ সাদী (রহ), শেখ সাদী'র শ্রেষ্ঠ ১৫২ গল্প (ঢাকা: সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৭-১৮।

[৪৩] শেখ সা'দি, বুস্তানে *সা'দি*, *https://ganjoor.net/saadi/mavaez/masnaviat/sh41*

[৪৪] মোহাম্মাদ সুদি, *শারহে সুদি বার গুলিস্তান সাদি* (তাবরিজ: মারকাযে নাশরে ফারহাঙ্গি বেহরারিন, ১৩৭৪ হি.শা./ ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৯১-৯২।

[৪৫] *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পৃ. ৩০৮।

[৪৬] *দিভানে হাফিয*, পৃ. ৩৮।

[৪৭] *কেতাবে ইরান তারিখে আদাবে পারসি মাকতাবহা, দোরেহা, সাবকহা ওয়া আনভা'য়ে আদাবি*, পৃ. ৬৭-৬৮।

[৪৮] *দিভানে হাফিয*, পৃ. ৫১৫।

[৪৯] *কেতাবে ইরান তারিখে আদাবে পারসি মাকতাবহা, দোরেহা, সাবকহা ওয়া আনভা'য়ে আদাবি*, পৃ. ২২৫।

[৫০] *দিভানে হাফিয*, পৃ. ৩৬।

[৫১] *মসনবী শরীফ*, , পৃ. ৩৪।

[৫২] *কেতাবে ইরান তারিখে আদাবে পারসি মাকতাবহা, দোরেহা, সাবকহা ওয়া আনভা'য়ে আদাবি*, পৃ. ২৩৯-৪০।

[৫৩] আমির খসরু দেহলভি, *দিভান* (তেহরান: সাজেমানে মোতালেয়ে ওয়া তাদবিনে কুতুবে উলুমে ইনসানি দানেশগাহহা (সামত), ১৩৯০ হি.শা./ ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৯।

[৫৪.] *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, পৃ. ৭০।

[৫৫] মির্জা গালিব, *দিভান*, *https://www.rekhta.org/ghazals/hazaaron-khvaahishen-aisii-ki-har-khvaahish-pe-dam-nikle-mirza-ghalib-ghazals?lang=ur*

[৫৬] কাজী নজরুল ইসলাম, *সাম্যবাদী* (ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০২৪ খ্রি.), ১৮।

[৫৭] ড. ইসমাইল হাকিমি, *আদাবিয়াতে মোআসেরে ইরান* (তেহরান: এন্তেশারাতে আসাতির, ১৩৭৪ হি.শা./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৩-১৪।

[৫৮] *মসনবী শরীফ*, পৃ. ৩৫।

[৫৯] ড. মোহাম্মদ জাফর ইয়াহাক্কি, *চুন সাবুয়ে তেশনে* (তেহরান: নাশরে জাম, ১৩৭৫ হি.শা./ ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১২০।

[৬০] নিমা ইউশিজ, *দিভান* (তেহরান: এন্তেশারাতে তুস, ১৩৬০ হি.শা. / ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

[৬১] *চুন সাবুয়ে তেশনে*, পৃ. ২৩।

[৬২] *দিভানে হাফিয*, পৃ. ৬২২।

[৬৩] মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি, *মসনভি*, *দাফতারে আওভাল*, *https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh96*

[৬৪] *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, পৃ. ৬১।

[৬৫] *দিভানে হাফিয*, পৃ. ৩৩।

[৬৬] *মসনবী শরীফ*, পৃ. ৩৫।

[৬৭] *দিভানে হাফিয*, পৃ. ৩৬।